Vidyasagar University Journal *of* History, Volume IV, 2015-2016, Pages: 159-172

ISSN 2321-0834

# বৈপ্লবিক সংস্কৃতি চর্চার সম্প্রসারণে নাড়াজোল রাজ ও নাড়াজোল এইচ. ই. স্কুল

মঙ্গল কুমার নায়ক

***সারসংক্ষেপঃ*** *স্বাধীনতা আন্দোলনকালে মেদিনীপুর জেলা বিপ্লবী সংগ্রামের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক যৌবনের আত্মবলিদানে ভাস্বর হয়ে উঠে। এই সময়ে মেদিনীপুর শহরের পাশাপাশি নাড়াজোলকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী কর্মকান্ড মেদিনীপুরের উত্তর অংশে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবী কর্মসূচীতে নাড়াজোল রাজ ও নাড়াজোল এইচ. ই. স্কুল, স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকরা জড়িয়ে গিয়েছিল। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার', 'অভয় আশ্রম', 'যুগান্তর দল-এর মত বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির শাখা সংগঠন নাড়াজোলের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। বিপ্লবী কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণও আন্দোলিত হয়েছিল। সমকালীন সময়ের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট ও ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করে এই বিষয়ে অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।*

***মূল শব্দগুচ্ছঃ*** *বিপ্লবী, গুপ্ত সংগঠন, গোয়েন্দা বিভাগ, স্কুল, নাড়াজোল রাজ।*

## *ভূমিকা*

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দমন-পীড়ন, বঞ্চনা, আর নরমপন্থী কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির কারণে যুব সমাজের একটি অংশ বিপ্লববাদের দিকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচীকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে গড়ে উঠেছিল নানা নামের আখড়া, ব্যায়ামাগার, ও প্রতিষ্ঠান। 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর দল', 'অভয় আশ্রম' 'ঢাকা শ্রী সংঘ'র মত নানা ধরণের গুপ্ত সংগঠনের শাখা সারা বাংলাদেশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল। বঙ্গবিভাজন-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই ধারার সূচনা ঘটে। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম এবং তার বিপ্লবী শিক্ষক সত্যেন বসু ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে জেলাতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের স্ফুরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার যৌবন আপন জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী ধারার মহান ঐতিহ্যকে রেখেছিল উজ্জ্বল করে।

এই নিবন্ধের প্রাথমিক পর্বে যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হল নাড়াজোলের জমিদার এই আন্দোলনে যুক্ত হলেন কেন? জমিদাররা তো শাসক বর্গের প্রতিনিধি, তাহলে এদেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণের পেছনে কোন কারণ ছিল কি? সমগ্র দেশ জুড়ে জমিদাররা তখন ইংরেজ ভজনায় ব্যস্ত। এই মেদিনীপুর জেলাতে মহিষাদল ও ঝাড়গ্রামের মত বড় জমিদাররা যখন ইংরেজ শাসনকে নানাভাবে সাহায্য করতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময়ে নাড়াজোলের মত জমিদার বিপ্লবী আন্দোলনের পেছনে সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে দাঁড়ালেন কেন? এটা কি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা? শুধু তাই নয়, অর্থ সাহায্য ও আইনি সাহায্য দিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে রক্ষা করার চেষ্টাও করে গেছেন এবং নাড়াজোল হাইস্কুলকে (এইচ. ই. স্কুল) বিপ্লবী কর্মী তৈরীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গদেশ তথা মেদিনীপুরের নানা স্কুল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবাহে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পরিচালনব্যবস্থাতে সরকার নিজের লোক নিয়োগ করে সরকার-বিরোধী কাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। নাড়াজোল স্কুল এদিক থেকে অনন্য ছিল, কোন ভাবেই

সরকার এই স্কুলের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে নি, বারে বারে চেষ্টা করে গেছে নিয়ন্ত্রণ করার কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বিপ্লবী আন্দোলনে সাহায্যকারী হিসেবে এই স্কুল বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তা সম্ভব হয়েছিল নাড়াজোল রাজের সরাসরি স্কুলকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে। এই গবেষণা পত্রে প্রাসঙ্গিক পর্ব ধরে কেবল নাড়াজোলরাজ ও নাড়াজোল হাইস্কুলের ভূমিকাটি অনুসন্ধান করে দেখা হল।

***বিপ্লবী আন্দোলন, মেদিনীপুর, ও নাড়াজোল এইচ ই স্কুল***

বিংশ শতাব্দীর মুক্তি আন্দোলনে ত্রিশের দশকটি ছিল আত্মবলিদানের স্বর্ণযুগ। বাংলা, পাঞ্জাব, মেদিনীপুর, কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ একের পর এক অঞ্চলের বিপ্লবী কর্মকান্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এই যুগে শত সহস্র প্রাণের আত্মাহূতিতে যৌবন মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে। আর এই সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে মেদিনীপুর জেলাতেও সশস্ত্র সংগ্রামের নব নব অধ্যায় রচিত হতে লাগল। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে প্কুলতিনজন অত্যাচারী জেলাশাসককে বিপ্লবীরা নিধন করে বিপ্লবী সংগ্রামকে উজ্জীবিত করে তোলে। বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষ জেলাশাসক পেডিকে, প্রভাংশু পাল ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জেলাশাসক ডগলাসকে এবং মৃগেন দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজা জেলাশাসক বার্জ-এর জীবন স্তব্ধ করে দেয়। এদের মধ্যে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র, বাকী পাঁচজন ছিলেন তদানিন্তন হার্ডিঞ্জ এম. ই. স্কুলের ছাত্র, বর্তমানে যার নাম বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালক।[১] এই ঘটনার ফলে তদানিন্তন সরকার পনের দিনের নোটিশে ঐ স্কুল বিল্ডিং ভেঙে দিয়ে খেলার মাঠ করে দিয়েছিল।[২] উল্লেখ করা যায় যে, ক্ষুদিরাম ছিল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র এবং তার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু হেমচন্দ্র কানুনগো ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। সুতরাং একথা সহজেই বলা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার স্কুলের ছাত্রদের যুক্ত হয়ে পড়ার একটি ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকেই ছিল। যদিও ত্রিশের দশকে জেলাতে স্কুল ছাত্রদের বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ার পেছনে দিনেশ গুপ্তের বিশেষ অবদান ছিল। ১৯২৮ সালে ঢাকা 'শ্রীসংঘে'র সদস্য দীনেশ গুপ্তের মেদিনীপুরে আসার পর থেকে জেলায় দ্বিতীয় পর্বের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, জমিদার কিশোরীপতি রায় সহ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে জেলার আন্দোলনকে সচল করে রেখেছিলেন। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের 'সরকারী ট্যাক্স বর্জন' আন্দোলন জেলার সমস্ত অংশের মানুষকে বিভেদ ভুলে একই সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।[৩]

ত্রিশের দশকের মধ্যপর্বে যুগান্তর দলের অংশ থেকে বেরিয়ে আসা গোষ্ঠীটি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এর প্রধান স্থপতি ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সত্য গুপ্ত, রসময় সুর ও সুপতি রায়চৌধুরী। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে পরবর্তীকালে বিনয় বোস, সুধীর গুপ্ত (বাদল), দীনেশ গুপ্ত প্রমুখ যুক্ত হয়েছিলেন।[৪] বি. ভি. সদস্যদের দ্বারা যে সাতটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান তিনটি ছিল মেদিনীপুরে পরপর তিনজন জেলাশাসক নিধন পর্ব।[৫] মেদিনীপুরে বিপ্লবী কর্মসূচী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে দীনেশের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হলেও তার আসল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী সংগঠনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা। দীনেশ গুপ্ত তিনবছর মেদিনীপুরে থাকাকালীন চল্লিশ জনের বেশী ছাত্রকে বিপ্লবী সংগঠনে যুক্ত করেছিলেন।[৬] সবাই ছিল স্কুল কলেজের ছাত্র। ছাত্রদের উপর দীনেশের প্রভাব ছিল অপরিসীম।[৭]

দীনেশ গুপ্তের পরিচালিত বি. ভি. ছাড়াও ইংলন্ড-ফেরৎ শচীন মাইতি পরিচালিত 'যুগান্তর দল', ক্ষিরোদ দত্তের 'অনুশীলন সমিতি', হেমেন্দ্র রায় চৌধুরীর 'অভয় আশ্রম'

মেদিনীপুরে কাজ শুরু করেছিল।[৮] এছাড়াও ১৯৩০ সালে 'বেঙ্গল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন'-এর শাখা মেদিনীপুরে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সংগঠন থাকলেও কোন বিরোধ লক্ষ্য করা যায় নি। একে অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার চেষ্টা চলত। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে চলে যাওয়ার পরে বারিশালের শশাঙ্ক দাশগুপ্ত (কমেট দা) মেদিনীপুরে বি. ভি.-র দায়িত্বে এসেছিলেন। সংগঠনগুলি বিভিন্ন আখড়া স্থাপন করে কুস্তি, লাঠি খেলা, ও শরীরচর্চা করলেও সকলের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষ কর্মী সংগ্রহ করা। অভয় আশ্রম পরিচালিত 'তিলক পাঠাগার'-এর মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরের সমস্ত বিপ্লবী ছাত্ররা দেশসেবা মূলক পুস্তক পাঠের সুযোগ পেয়েছিল। এই সময়ে ছাত্রদের এক গোপন সভাতে দীনেশ গুপ্ত বলেছিলেন "তোমরা এই আন্দোলনে অংশ নেবে, তা না করলে সংগ্রামী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই সুযোগে তোমরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে আপন করে নেবে। তাদের দুঃখের ভাগীদার হবে।"[৯] এই নির্দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল।

মেদিনীপুর শহরের কলেজ ও স্কুলকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী আন্দোলনের যে প্রবাহ শুরু হয়েছিল তার ঢেউ এসে লাগল জেলার উত্তর পূর্বের অংশের স্কুলগুলিতেও। ত্রিশের দশকের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল নাড়াজোল এইচ. ই. হাইস্কুল।[১০] অবশ্য বিশ শতকের প্রথম থেকেই ঘাটাল মহকুমা জুড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। উদ্যোক্তারা ছিলেন কেঁচকাপুরের জমিদার বিহারীলাল ও নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ, জাড়ার জমিদার কিশোরীপতি রায় ও সাতকড়ি পতিরায়, নাড়াজোলের জমিদার নরেন্দ্রলাল খান ও দেবেন্দ্রলাল খান। এদের মধ্যে একমাত্র নাড়াজোলের রাজা ছিলেন বিপ্লবী সংগ্রামের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[১১] ১৯০৮ সালে মেদিনীপুর বোমা মামলাতে নাড়াজোল রাজের গ্রেপ্তার ও কারাবরণ ঐ পর্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ সময়ে শহরের নানা ধরণের ব্যায়ামাগার, গুপ্ত সমিতি, স্বাদেশী ভাণ্ডারের পাশাপাশি ক্ষুদিরামকেও নাড়াজোলএর রাজা নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ক্ষুদিরামকে নিজের প্রাসাদে রেখে পড়াশুনা করাতে চেয়েছিলেন, যদিও ক্ষুদিরাম সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি দেশের কাজ করার জন্য। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পরে এই অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনস্রোত অব্যাহত ছিল। চুয়াড় বিদ্রোহের সময় থেকে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে নাড়াজোলরাজ যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন এই পর্বেও তা সমানভাবে উজ্জ্বল ছিল।

১৮৯৪ সালে রাজা নরেন্দ্রলাল খান তার পিতা রাজা মহেন্দ্রলাল খানের নামে নাড়াজোল পাঠশালাটিকে স্কুলে উন্নতি করে উৎসর্গ করেন। ১৯১১ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের তথ্য থেকে মেদিনীপুর জেলার মোট সতেরটি হাইস্কুলের নাম জানা যায়, যার মধ্যে এই হাইস্কুলের নাম ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৯ সালে এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৬ জন।[১২] এই স্কুলের পরিচালনাসহ যাবতীয় ব্যায়ভার নাড়াজোল রাজার পক্ষ থেকে বহন করা হত।

লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে পড়েছিল। ছাত্ররা স্কুল কলেজের গন্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ছাত্ররা আন্দোলনের প্রথম সারিতে চলে আসায় শাসক শ্রেণি অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সময়ে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে তিনজন অত্যাচারী জেলাশাসক ছাত্রদের হাতে নিহত হলে জেলাবাসীর উপরে লাগাম-ছাড়া অত্যাচার শুরু হয়। বিশেষ করে শহরের ছাত্রদের চলাফেরার উপরে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ হয়। রাস্তাঘাটে যাতায়াতের সময় ছাত্রদের তিন ধরণের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হত, লাল, হলুদ ও সাদা রঙের। লাল কার্ডধারী ছাত্ররা ছিল পুলিশ বিভাগের খাতায় প্রথম সারির সন্দেহভাজন।[১৩]

মেদিনীপুর শহরে বি. ভি.-র সদস্যরা বিপ্লবী আন্দোলনের যে ঝড় তুলেছিল তা নাড়াজোল হাইস্কুলে গিয়েও লেগেছিল। ছাত্র আন্দোলনের উত্তাপ থেকে স্কুলটি দূরে ছিল না।[১৪] এই স্কুলের ছাত্র নিকুঞ্জ বিহারী চৌধুরী তার অভিজ্ঞতায় লিখেছেন "আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে রাজপরিবারের মধ্য থেকে রবীন্দ্রলাল ও বীরেন্দ্রলাল খান অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আওয়াজ তুলতেন "Up! Up! National Flag; Down Down Union Jack."[১৫] এই স্কুলের পরিচালনা, পঠন-পাঠন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও বৃহত্তর রাজনৈতিক জগৎ সম্পর্কে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সঙ্গে স্কুলের পরিচালক মন্ডলীসহ শিক্ষকরা কিভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল তার চাঞ্চল্যকর বিবরণ সংরক্ষিত আকারে রয়েছে রাজ্যে লেখ্যাগারে। সরকারের 'গুপ্ত ও বিশ্বাস নির্ভর বিভাগ' থেকে পাওয়া তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল।

নাড়াজোল হাইস্কুলের প্রধান পরিচালক ছিলেন দেবেন্দ্রলাল খান। স্কুলের সমস্ত প্রকার কাজকর্মের উপরে দেবেন্দ্রলাল ও সচিব জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রভাব ছিল। দেবেন্দ্রলাল খান ছিলেন আমৃত্যু সভাপতি ও বিজয় খান ছিলেন সম্পাদক।[১৬] সরকারের কোন সন্দেহ ছিল না যে এমন স্কুল, যার কর্মাধ্যক্ষরাই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক, তা এমন কাণ্ডের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে। [১৭] ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সালে স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সুপারিশে স্কুলের ছাত্র কানাইলাল হাজরাকে মাসিক ৪/৫ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হোত এবং টাকা কুমারের তহবিল থেকে সরবরাহ করা হত। কানাইলাল ছিলেন নাড়াজলের গুপ্ত সমিতির সদস্য। মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।[১৮] নাড়াজোলের গুপ্ত সমিতির সদস্যদের জন্য অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। জ্ঞানবাবু এই কাজটি দেখাশুনা করতেন। ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জ্ঞানবাবু নাড়াজোলের গুপ্ত সমিতির জন্য পঞ্চাশ টাকা দিয়ে রিভলবার কেনার প্রতিশ্রুতি ঐ অঞ্চলের কর্মীদেরকে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে রিভলবারের মালিক চুক্তির শর্তাবলী না মানায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি। [১৯]

শুধু বোমা বারুদ সংগ্রহ নয়, গুপ্ত সমিতির জন্য নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ, ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া প্রভৃতি কাজ নাড়াজোলের রাজার পক্ষ থেকে করা হত। কানাইলাল হাজরা, বিনোদ বেরা, নিত্যানন্দ পন্ডিত প্রভৃতি ছাত্রদের যে বৃত্তি দেওয়া হত তা জ্ঞানবাবু ব্যবস্থা করেছিলেন নাড়াজোলের জমিদার কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের তহবিল থেকে।[২০] জ্ঞানবাবু নাড়াজোলের গুপ্ত সংস্থার কেবল যে অনুরাগী ছিলেন তায নয়, তাদের নিয়মিত অর্থিক সাহায্য করতেন এবং গুপ্ত সমিতির পঠন-পাঠনের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সহায়তাও করেছিলেন। [২১] নাড়াজোলের বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটি কানাইলাল হাজরা রক্ষা করত। কানাই হাজরার সহপাঠী নিত্যানন্দ পন্ডিতের সঙ্গে জ্ঞানবাবুর যোগাযোগ ছিল। কানাই হাজরাকে বহির্জগতের বিপ্লবী আন্দোলনের সংবাদ জ্ঞানবাবু চিঠিতে জানাতেন। শিক্ষক ললিত মিশ্রের হাতে এই রকমের কয়েকটি চিঠি পড়ায় তিনি সেগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।[২২]

নাড়াজোল হাইস্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূলত রাজনৈতিক। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে পুলিশকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল তা থেকে এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্রলাল মল্লিক একবার ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আশায় মিন্টোপার্কে গিয়ে কুমার দেবেন্দ্রলাল খানকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কুমার পরিষ্কারভাবে দেবেন্দ্রনাথ মল্লিককে বলেছিলেন, 'কোন কাজ না করে, তুমি আমার কাছ থেকে কোন কিছু আশা করো না।' পরবর্তীকালে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক এটাই বলেছিলেন।[২৩]

*বিপ্লবীদের দ্বারা নির্বাচিত ছাত্রদের স্কুলে ভর্তি করার সম্পর্ক*

১৯৩০ এর দশকে বিপ্লবী আন্দোলনের দিনগুলিতে নাড়াজোল হাইস্কুল হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল। যে সমস্ত ছাত্রদেরকে বিপ্লবী কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার অপরাধে বিভিন্ন স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হত তাদের এবং যে সমস্ত ছেলেকে বিপ্লবীদলের মনে হত, ছেলেটিকে শিক্ষা দিলে বিপ্লবী দলে কাজে লাগবে, সেই সমস্ত ছেলেদের এনে এই হাইস্কুলে ভর্তি করানো হত। সুধীর চক্রবর্তী, আশুতোষ ব্যানার্জী (পুলিশের চোখে ছিলেন সন্দেহভাজন) কে কানাই হাজরা নাড়াজোল হাইস্কুলে ভর্তি করানোর জন্য এনেছিলেন। এ বিষয়ে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নীলেন্দ্র বাগচী পুলিশের কাছে বিবৃতি দিয়েছিলেন।[২৪]

আশুতোষ ব্যানার্জী পরবর্তীকালে বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে লেগেছিল তা জ্ঞানবাবুর চিঠি থেকে জানা যায়। ১৯৩৫ সালে মেদিনীপুর শহরের পাটনাবাজারের সন্তোষ বেরাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে লকাপের মধ্যে অত্যাচার চালিয়ে মেরে দিয়েছিল। ঐ কর্মীটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য, ময়না তদন্তের রিপোর্ট জ্ঞানবাবুকে জানানোর জন্য নাড়াজোলের আশুতোষ ব্যানার্জীকে চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আশুতোষ সে কাজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।[২৫] এই ঘটনাটিকে অনুসন্ধান করার জন্য জ্ঞানবাবু কানাই হাজরাকে চিঠি দিয়েছিলেন।[২৬] ঐ সময়েই আশুতোষ যে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন তা সরকারী নথিতেই প্রমাণিত। [২৭]

*বিপ্লবী কাজের জন্য নিযুক্তদের দলের কাজে নাড়াজোল পাঠানো*

গড়বেতা থানার রামগড় হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন অমূল্য চরণ দে। তিনি এক সময়ে বাংলাদেশের ফরিদপুরের আটক বন্দী ছিলেন। বিপ্লবী কাজকর্মে যুক্ত থাকার অপরাধে স্কুল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তখন অমূল্যবাবুকে বিপ্লবী কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে নাড়াজোল হাইস্কুলে চাকুরী দেওয়ার জন্য জ্ঞানবাবুর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল কারণ স্কুলে শিক্ষকতা করার সাথে সাথে যাতে তিনি সরাসরি দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গোচরে আশায় উক্ত কাজটি বন্ধ হয়ে যায় এবং জেলা থেকে অমূল্যবাবু চলে যান।[২৮] নাড়াজোল এইচ. ই হাইস্কুল সম্পর্কে পুলিশ যখন তদন্ত চালাচ্ছিলেন(১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি) তখন হুগলীর জনৈক এক ব্যক্তি ১.৬.১৯৩৬ সালে পুলিশের কাছে বিবৃতি দিয়েছিলেন।[২৯]

*নাড়াজোলের বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে অভয় আশ্রমের যোগাযোগ*

নাড়াজোলের বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে অভয় আশ্রমের যোগাযোগ ছিল। অভয় আশ্রমের কর্মী হেমেন্দ্র বিজয় রায়চৌধুরী ১৯৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য মেদিনীপুরে এসেছিলেন। তিনি জ্ঞানবাবুর যোগাযোগের মাধ্যমে নাড়াজোলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে নাড়াজোলের বুড়া অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন দত্তের সহযোগিতায় সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। হেমেন্দ্র বিজয়ের সঙ্গে নাড়াজোলের রবীন্দ্রলাল খানের যোগাযোগ ছিল। উভয়ে মিলে নাড়াজোলের যুগান্তর শাখাকে শক্তিশালী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।[৩০]

চিত্তরঞ্জন দত্ত ও হেমেন্দ্রবিজয় রায়চৌধুরী নাড়াজোলের সতীশ খানের বাড়ীতে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে সন্দেহভাজন চিত্তরঞ্জন দত্ত, হেমেন্দ্র বিজয়, নাড়াজোলের সতীশ খানের বাগান বাড়ীতে বিনোদ বেরা, কানাই হাজরা, চন্ডি হড়, নিতাই পন্ডিত, হরিপদ সিং, বিত্ত দত্ত

প্রভৃতিকে নিয়ে সভা করত। সেখানে বই পড়া, তলোয়ার চালানো এবং যুদ্ধের কৌশল শিখানো হত।[৩১] কলকাতাতে সারা বাংলা ছাত্র সংগঠন (All Bengal Students' Association) গড়ে উঠেছিল এবং তার সঙ্গে নাড়াজোলের ছাত্রদেরও যোগাযোগ ছিল। উত্তরপাড়ার বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জীও নাড়াজোলে যাতায়াত করতেন। এই অঞ্চলে ছাত্রদের সংগঠন তৈরী করার ক্ষেত্রে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল [৩২] হেমেন্দ্র বিজয় ও চিত্তরঞ্জন দত্ত কংগ্রেস কর্মী হিসাবে সতীশ খানের বাড়িতে থাকলেও তারা যে ছিলেন বিপ্লবী কর্মী তা ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ সালে একটি হলফনামাতে এক ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছিল।[৩৩] ত্রিশের দশকে মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঢাকার ময়মন সিংহের বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রীসঙ্ঘে'র বিশেষ অবদান ছিল। ময়মন সিংহের থেকে দীনেশ গুপ্ত ও শশাঙ্ক দাশগুপ্ত (ওরফে কমেট) মেদিনীপুরে এসেছিলেন।[৩৪] এ বিষয়ে আরও জানা যায় যে, অভয় আশ্রমের কর্মী হেমেন্দ্র বিজয় রায়চৌধুরী ছিলেন কুমিল্লার অভয় আশ্রমের কর্মী। ১৯৩২-৩৩ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি মেদিনীপুর আসেন ও ছয়-সাত মাস নাড়াজোলে অবস্থান করেছিলেন। স্থানীয় রবীন্দ্রলাল খানের চেষ্টায় সেখানে যুগান্তর দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৫]

নাড়াজোলের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে গড়বেতার বিপ্লবী আন্দোলনের গভীর সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে ১৯২৫ সালের পরে গড়বেতার বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে নাড়াজোল সহ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিপ্লবী সংগঠনগুলির মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 'অভয় আশ্রম' আর 'যুগান্তর দলকে' কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। গড়বেতার রাজেন্দ্র চৌধুরী, পরেশ আচার্য, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, সুশীল সরকার, রমেশ ধর প্রমুখ কর্মীরা অভয় আশ্রমের কর্মসূচীকে গড়বেতা জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৩৬] অভয় আশ্রমের বিপ্লবী কর্মসূচীতে গড়বেতার জমিদার রামসুন্দর সিং বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচী পালন করার পাশাপাশি তিনি বিপ্লবী কর্মসূচীকেও সফল করার চেষ্টা করতেন।[৩৭] শুধু রামসুন্দরবাবু নন, গড়বেতা থানার আমলাগোড়ার ডাঃ নীলমাধব সেনও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আবার বাঁকুড়া জেলার অভয় আশ্রম পরিচালনার আন্যতম নেতৃত্ব ছিলেন।[৩৮]

গড়বেতার অভয় আশ্রমের বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে ঢাকার হেমেন্দ্র বিজয় রায়চৌধুরীর সম্পর্কও গভীর ছিল। তিনি গড়বেতায় এসেছিলেন। জানুয়ারী ১৯৩২ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত গড়বেতা, দাঁতন, নন্দীগ্রাম, তমলুকসহ অন্যান্য অঞ্চলে অভয় আশ্রম ও যুগান্তর দলের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। এই পর্বে তিনি দীর্ঘ কয়েক মাস নাড়াজোলের খান পরিবারের আশ্রয়ে ছিলেন।[৩৯] গড়বেতার গুপ্ত সমিতির কর্মধারার সঙ্গে ছাত্ররা বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। বিশেষ করে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র এই এলাকার বিপ্লবী কর্মসূচী রূপায়নে নিযুক্ত ছিলেন। সমকালীন গোয়েন্দা রিপোর্টে এই সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। [৪০] এইভাবে ত্রিশের দশকে গড়বেতাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অভয় আশ্রমের শাখা গড়বেতা ও নাড়াজোলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে দুইটি স্থানে বিপ্লবী দলের কর্মসূচী প্রায় একই সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। যদিও নাড়াজোলের বিপ্লবী কর্মরীতি ছিল ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

***স্কুল থেকে ছাত্রদের সংগঠনে আনার ক্ষেত্রে খান পরিবারের ভূমিকা***

নাড়াজোল হাইস্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে খান পরিবারের যোগাযোগ ছিল অন্তরঙ্গ। রাজাদের সহযোগিতাতে স্কুল চলত ও পরিচালিত হত বলে স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে রাজপরিবারের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ছাত্ররাও রাজাকে সমীহ করত। আবার বেশ কিছু ছাত্র রাজার তহবিল থেকে

বৃত্তি পেত বলে, ছাত্রদের সঙ্গে রাজপরিবারের যোগাযোগ ছিল গভীর। তাছাড়াও রাজনৈতিক আন্দোলনে খান পরিবারের যুক্ত থাকার কারণে কিছু কিছু উদ্যমী ছাত্র রাজার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এমনকি দেবেন্দ্রলাল খান নিজে সরাসরি উদ্যমী ছাত্রদের প্রতি নজর রাখতেন। ভাল বলে মনে হলে তাদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতেন এবং তাদের মানসিকতা বিচার করে তাদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিয়ে যেতেন। ১৯২৮ সালে এই স্কুলের ১০ জন ছাত্রকে রাজার মদতেই কলিকাতার পার্কসার্কাসের মিলিটারী ট্রেনিংতে পাঠানো হয়েছিল। উল্লেখ্য যে ঐ ট্রেনিং ক্যাম্পে বি. ভি.-র সদস্যদেরই ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত অনন্ত মুখার্জী ১৯৩৪ সালে নাড়াজোলে যুগান্তর দলের কাজ শুরু করেছিল। এই দলে পরবর্তীকালে নাড়াজোলের সুশান্ত মাইতি ও শচীন মাইতি যুক্ত হয়েছিলেন। খান পরিবারের রবীন্দ্রলাল খান এই দলের সদস্য ছিলেন।

অক্টোবর ১৯৩৫ সালে পুলিশের কাছে দেওয়া এক বিবৃতিতে একজন ব্যক্তি স্বীকার করেছিল যে, তাঁকে রবীন্দ্রনালাল খান নাড়াজোল হাইস্কুলের দলপতি বিনোদ বেরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রলাল খান ও বিনোদ বেরা দুজনে আলাদা আলাদা দুটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই দুটি ছিল যুগান্তর ও বি. ভি. দল। বিনোদ বেরার বি. ভি. দলকে নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের ব্যক্তিগত সচিব জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু অর্থনৈতিক ও মানসিক দুই দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন।[৪১]

নাড়াজোল হাইস্কুলের যে সমস্ত ছাত্ররা পুলিশের খাতায় প্রধান সন্দেহভাজন ছিলেন তাঁরা হলেন, রবি খান, ফণী খান, মদন খান, কানাইলাল হাজরা, নিত্যানন্দ পন্ডিত, অনিল ঘোষ, বলাই নিয়োগী, গণেশ রায়, বিজন বাগ, গৌর হাজরা ও বিনোদ বেরা।[৪২] হাইস্কুলের যে সমস্ত ছাত্ররা বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের পঠন-পাঠনের জন্য নানা ধরণের পত্র-পত্রিকা, পুস্তক নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হত। তখনকার দিনে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের নানা ধরনের বই পড়তে হত। বিশেষ করে দেশ-বিদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের কাহিনী, স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, যা পড়ে ছাত্ররা দেশের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠত। ১৯৩২ সালে জাতীয় সাহিত্য চর্চার জন্য নাড়াজোলে রাজার অর্থানুকুল্যে স্কুলে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিতি হয়েছিল। নাড়াজোলের স্কুলের ছাত্র বিনোদ বেরা ছিলেন এর গ্রন্থাগারিক।[৪৩] রবি খান, সতীশ খান, শচীন মাইতি প্রমুখ ছাত্ররা লাইব্রেরী থেকে বই সংগ্রহ করে ছাত্রদের পড়ার জন্য দিতেন আবার পড়া হয়ে গেলে যথা সময়ে তা ফেরৎ নিয়ে নেওয়া হত।

নাড়াজোলে যে All Bengal Students Association-এর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার ছাত্ররাও বিপ্লবী দলের পত্র-পত্রিকা পড়তেন। তবে যুগান্তর, অনুশীলন, অভয় আশ্রম, বি. ভি. নামে নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলে স্কুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও সংগঠনগুলির মধ্যে কোন গোষ্ঠী কোন্দল, দলাদলি লক্ষ্য করা যায়নি। একজন ছাত্র একাধিক সংগঠনের সদস্য হতে পারত। এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমিতিগুলির ছাত্রদের জন্য বইপত্রও একই ধরণের ছিল। লাইব্রেরী থেকে তা সরবরাহ করা হত। লাইব্রেরী পরিচালনা, তাতে পত্রিকার যোগান, কোন ধরণের বইপত্র সেখানে সরবরাহ করা হত, কারা করত, পাঠক কারা ছিলেন এই সংক্রান্ত গোয়েন্দা বিভাগের যে গুপ্ত তথ্যটি জানা গিয়েছে তা এখানে উপস্থাপন করা হল। এই তথ্য থেকে নাড়াজোল হাইস্কুলের বিপ্লবী সংগঠনের কার্যকলাপসহ নেতা, কর্মী ও তাদের আর্থিক বিষয় এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।[৪৪]

১৯৩৫ সালের ৯ই নভেম্বর বিনোদ বেরার বাড়ী পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়েছিল। সেই তল্লাসীতে লাইব্রেরী সংক্রান্ত যে তথ্য জানা গিয়েছে তা হল, বিনোদ বেরা, কানাইলাল হাজরা, চন্ডি হরের মত ছাত্ররা 'বিপ্লবের পরে রাশিয়া', 'তরুণের বিদ্রোহ', 'আইরিশ বিদ্রোহ' ইত্যাদি

গ্রন্থপাঠে অভ্যস্ত ছিল।[৪৫] প্রমাণ হয় যে, নাড়াজোল স্কুলকে কেন্দ্র করে গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যকলাপ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, বই এর পাঠক ও পুস্তক তালিকা থেকে বোঝা যায় কী ধরনের সংস্কৃতির চর্চা ছাত্রদের মধ্যে চলত, আর নাড়াজোল রাজা কিভাবে এতে যুক্ত ছিলেন। মূলত রাজার আর্থিক বদান্যতায় লাইব্রেরী গড়ে তোলা ও বইপত্র সংগ্রহের কাজটি পরিচালনা করা হত। জ্ঞানবাবু এই কাজে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন তা সরকারী নথিতেই প্রমাণিত।

***নাড়াজোল হাইস্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও বিপ্লবীদের প্রতি রাজার মনোভাব***

নাড়াজোল হাইস্কুলের শিক্ষকরাও বিপ্লবী দল এবং বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি মনোভাবাপন্ন ছিলেন।[৪৬] কেউ সরাসরি, কেউ বা নীরবে, অজান্তে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের সাহায্য করতেন। এর পেছনে দেশভক্তি মনোভাবের পাশাপাশি অন্য একটি বাধ্যবাধকতা কাজ করেছিল তা হল স্কুলের পরিচালক মন্ডলীর প্রভাব। স্কুল পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা দেবেন্দ্রলাল খানের হাত ছিল। ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে বার বার চেষ্টা করা হয়েছিল স্কুলের পরিচালন মন্ডলীতে সরকারী প্রতিনিধি রাখার জন্য, কিন্তু নাড়াজোলের রাজার পক্ষ থেকে তা সরাসরি বাতিল করা হয়েছিল।[৪৭] হাইস্কুলের শিক্ষকদের আর একটি বিশেষ প্রশংসনীয় দিক ছিল তা হল, স্কুলের বিভিন্ন কাজকর্মের পুলিশী তদন্তের সময় এমন ঘটনা ঘটেনি যে, শিক্ষকেরা স্বেচ্ছায় কোন কথা পুলিশকে বলেছেন। ইহাও অতিরঞ্জিত নয় যে, এই সমস্ত শিক্ষকদের জাতীয়তাবাদ শিক্ষণ ও কাজকর্মের জন্য বাছাই করা হত।[৪৮] একজন ছাত্র বলেছিল, পরীক্ষার পর সহশিক্ষকদের অনুমোদন নিয়ে বিনোদ বেরার নেতৃত্বে ছাত্ররা দলবেঁধে রামজীবনপুর, ক্ষীরপাই, রাধানগরসহ কয়েকটি স্কুলে ভ্রমণের জন্য গিয়েছিল। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচার এবং যোগাযোগ গড়ে তোলা।[৪৯]

১৯৩৫ সালে নাড়াজোল হাইস্কুলের হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ললিত মোহন মিশ্র ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম অনুরাগী। তিনি হস্টেলের মধ্যে ছাত্রদের বিপ্লবী চর্চাতে উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে 'পথের দাবী', 'শিবাজী', 'বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়তেন ও ছাত্রদের পড়ানোর জন্য এই জাতীয় পুস্তকগুলি নিজে ছাত্রদেরকে সরবরাহ করতেন।[৫০] বিনোদ বেরা সম্পর্কে একটি চিঠিতে তিনি তাঁকে 'আদর্শ মানুষ' হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৫১] গোয়েন্দা বিভাগের দেওয়া বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, ১৯২৮ সালে কলিকাতাতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নাড়াজোল স্কুলের ৮/৯ জন ছাত্র শিক্ষক গোকুল বিহারী গোস্বামী, নকুল চন্দ্র পাল এবং সতীশ খানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।[৫২] বিনোদ বেরা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, নাড়াজোল হাইস্কুলের শিক্ষক নীলেন্দ্র বাগচী তাদের সংগঠনের একজন গভীর অনুরাগী ও দরদী ছিলেন।[৫৩] শুধু তাই নয়। নীলেন্দ্র বাগচী শিক্ষানুরাগী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। বাগচীবাবু মারা যাওয়ার পরে ললিত বাবু হস্টেলে সুপারের দায়িত্বে এসেছিলেন।[৫৪]

নাড়াজোল হাইস্কুলের সর্বশেষ বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন প্রধান শিক্ষকের ভাইপো শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক। তার কাজকর্মের জন্য জেলা শাসক তদন্ত করে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল।[৫৫] পরবর্তী বিষয় হল ছাত্র সংসদ কর্তৃক লাইব্রেরী পরিচালনা। পুলিশী তদন্তে বই বিতরণের লিস্ট থেকে জানা যায় যে, শিক্ষকরাও আপত্তিজনক বইপত্র পড়াশুনা করতেন। [৫৬] নাড়াজোল এইচ. ই. স্কুলে বিপ্লবী কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। ছাত্ররা যে গুপ্ত সমিতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন তাও সরকারী তদন্তে প্রমাণিত। তদন্ত করে সরকারের পক্ষ থেকে ২০/২৫ জন ছাত্রকে চিহ্নিত

করা হয়েছিল যারা সরাসরি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন। বিশেষ করে নাড়াজোল, কেশপুর, ডেবরা সহ পুরো ঘাটাল মহকুমা জুড়ে এদের কাজ বিস্তৃত ছিল, এমনকি বাঁকুড়া পর্যন্ত।[৫৭] স্কুলের অনেক ছাত্রকে গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হলেও অল্প সংখ্যক ছাত্রের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ ফাইল থেকে তাদের নাম ও মামলার ধারাগুলি জানা যায়।[৫৮] এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, স্কুলকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী কাজকর্মের প্রচার চালানো হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত নাড়াজোল রাজার পক্ষ থেকে স্কুলটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হোত, ততদিন স্কুলটি বিপ্লবের অতিগুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালের 'সাফাই' অভিযান ও M. R. 56, M.R. 67 এবং C.A. 57 ধারা সত্ত্বেও ছাত্রশক্তিকে জমায়েত করে সংগঠনকে জীবন্ত রাখার চেষ্টা সংগঠকরা করে যাচ্ছিলেন।[৫৯] ১৯৩৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল ও ১৯শে এপ্রিল স্কুল অফিস আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তথ্য প্রমাণ লোপাট করার জন্য পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছিল। কারণ যে সমস্ত ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সরকার বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের সম্পর্কে যাতে কোন প্রমাণ না থাকে।[৬০]

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে স্কুলটি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত স্কুলটিকে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলার তদানিন্তন জেলাশাসক এম. ও. কার্টার তার একটি চিঠিতে বর্ধমানের কমিশনারকে স্কুল সম্পর্কে সরকার বিরোধী কাজকর্মের সমস্ত প্রকার তথ্য সবিস্তারে জানান। ঐ চিঠিতেই তিনি সুপারিশ করেন, যেকোন প্রকারে স্কুলটির অনুমোদন যেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাতিল করা হয়। ১৯শে জুন ১৯৩৬ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর পক্ষ থেকে যে চিঠিটি লেখা হয়েছিল, সেই চিঠি 'গুপ্ত ও বিশ্বাস নির্ভর বিভাগ' থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই চিঠিটি থেকে স্কুল সম্পর্কে সরকারের অবস্থান জানা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে বারে বারে চেষ্টা করা হয়েছিল স্কুলটিকে নিয়ন্ত্রণ করার, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।[৬১] স্কুল সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠিটি বর্ধমানের কমিশনারকে পাঠানো হলে কমিশনার তা বাংলা সরকারকে জানিয়ে দেয়। তার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, বাংলা সরকারের হোম সেক্রেটারী ১৪ই জুলাই বর্ধমানের কমিশনারকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি (স্কুল সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি তাকে জানানো হয়েছিল) একটি নোট লেখেন স্কুল সংক্রান্ত বিষয়ে। তিনি চিঠির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, বিশেষ করে বিপ্লবীদের কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে।[৬২]

১৯৩৬ সালের পরে বাংলায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোর হাতে বাংলা তথা মেদিনীপুর জেলার বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য অত্যাচারের যে বন্যা বইয়ে দিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৩৫ সালে "ভারত শাসন আইন" চালু হওয়ার পরে কংগ্রেসের একটি অংশ সাংবিধানিক সংস্কার আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আর একটি অংশ চরমপন্থী আন্দোলনের পথেই চলছিল। অনুশীলন, যুগান্তর, বি. বি. সহ গুপ্ত সমিতির বহু সদস্য তখন সুভাষপন্থী হয়ে প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেক বিপ্লবী সদস্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গুপ্ত আন্দোলনের পথ থেকে সরে এসেছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে গুপ্ত সংগঠনগুলি নাড়াজোল হাইস্কুলটিকে কেন্দ্র করে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন বলে জেলা শাসকের দেওয়া তথ্য সম্পর্কে হোম সেক্রেটারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তার চিঠিতে। কিন্তু এটা আশ্চর্য যে, হোম সেক্রেটারী ১৪ই জুলাই তার চিঠিতে বিষয়টি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও ২০শে জুলাই আর একটি চিঠিতে (বর্ধমানের কমিশনারকে লেখা) অনুরূপ সন্দেহের কথা বলেও,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলটির অনুমোদন তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। আবার ঐ চিঠির তলায় শিক্ষা দপ্তরের একটি নোট রয়েছে যেখানে স্কুলটির অনুমোদন বাতিল করার কথা বলা হয়েছে।[৬৩]

সুতরাং শেষ পর্যন্ত স্কুলটির অনুমোদন বাতিল করার সুপারিশ করা হল। সরকার ও শিক্ষাদপ্তর উভয়েই একই সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বর্ধমানের কমিশনারকে জানিয়ে দিলেন। চিঠিতে নাড়াজোল হাইস্কুলকে অবৈধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানার ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেও স্কুলটির অনুমোদন বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হল। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই প্রশ্ন আসে তা হল, যে প্রতিষ্ঠানকে সরকারবিরোধী কাজকর্মের ক্ষেত্র বলে সন্দেহ করে সরকারই প্রশ্ন তুলেছেন, তারাই আবার অনুমোদন বাতিল করার কথা বলছেন। অথচ স্কুল সংক্রান্ত যতগুলি তথ্য 'গুপ্ত ও বিশ্বাস নির্ভর বিভাগ' থেকে পাওয়া গেছে তা সবই তদানিন্তন সরকার বিরধী কাজের নজির। আবার ২৪শে জুলাই ১৯৩৬ সালে তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সর্বশেষ যে চিঠিটি বর্ধমানের কিমিশনারকে লিখেছিলেন এবং চিঠির কপি বাংলা সরকারের সচিবকে পাঠিয়েছিলেন সেখান থেকে জানা যায় যে, নাড়াজোল হাইস্কুল সরকার বিরোধী কাজকর্মের প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সেখানে গুপ্ত সংগঠনেরই প্রভাব ছিল। যদিও ঐ চিঠিটিতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শিক্ষক গোলক বিহারী গোস্বামীর বিবৃতিকে যথোপযুক্ত নয় বলে বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের মতামতকে একেবারে অস্বীকার করা হয়নি।[৬৪] শেষ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলটির অনুমোদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় ১৬ বছর পর ১৯৫০ সালে স্কুলটি আবার সরকারী অনুমোদন লাভ করে।

নাড়াজোলের রাজাদের পক্ষ থেকে কংগ্রেস দল থেকে শুরু করে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত কর্মীদের সহ নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানে আর্থিকভাবে সাহায্যের বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর আন্দোলন পর্ব থেকেই বিভিন্ন সূত্রে (সরকারী ও বেসরকারী) জানা যায়। বিশাল আর্থিক সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে এটা যেমন তাদের কাছে কোন সমস্যা ছিল না আবার এর পিছনে দেশভক্তি, স্বাধীনতার আকুতি যে ছিল তাও নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হয়। এই সময়ে সম্পদশালী জমিদার হিসেবে মেদিনীপুরে আরও কয়েকজন জমিদার ছিলেন। তারা অকাতরে এইভাবে সাহায্য করেছিলেন কিনা তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে মহিষাদল, ঝাড়গ্রাম, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের রাজারা সাহায্য সহযোগিতা করলেও রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্যের ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা দেখা যায নি। নাড়াজোলের পাশাপাশি তমলুকের রাজারা অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন। আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি সম্পর্কে নাড়াজোলের কুমার একবার তার ব্যক্তিগত সচিবকে বলেছিলেন।

> "দেখুন বিনয়বাবু, আমি সব রাজনৈতিক দলকে টাকা দিই। কংগ্রেস ও আপনাদের সব চাইতে বেশী টাকা দিই। বাবা তিন-চার লাখ টাকার একটি জমিদারী রেখে গেছেন। সেই টাকাই কিছু কিছু যারাই ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের দিয়ে দিই। আমার দেশসেবাতো আপনাদের মত জান-প্রাণ কবুল করে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়। তবে আমি আপনাদের বলছি যে, আমি গ্রেপ্তার হতে বা জেলে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু হাত বাড়িয়ে হাতকড়া পরতে চাই না।"[৬৫]

নাড়াজোলের জমিদার কুমার দেবেন্দ্রলালের এই বক্তব্য থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতার বিষয়টিকে তিনি কোন দৃষ্টিতে দেখতেন। তার এই উদার প্রকৃতি ও এবং স্বাধীনতার প্রশ্নটি এখানে মূল বিচার্য বিষয় যা অন্যান্য জমিদারদের থেকে তাঁকে আলাদা করে।

*উপসংহার*

কিন্তু যে প্রশ্নটি এই গবেষণা পত্রের শুরুতেই উঠে ছিল তা হল, নাড়াজোলের জমিদার এই বিপ্লবী আন্দোলনের পেছনে দাঁড়ালেন কেন? জমিদাররা ছিলেন শাসকবর্গের প্রতিনিধি। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এদেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে তাদের নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ ছিল না। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণের কারণ কি ছিল? কোন কোন জমিদার কেন ভগ্ন রাজপ্রাসাদ আর অট্টালিকার অন্দর ছেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন? স্বাধীনতা আন্দোলনে জমিদারদের ভূমিকাটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা জানা গিয়েছে তা হল, যে সমস্ত জমিদাররা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন তাদের একটি বংশগত ঐতিহ্য ছিল তা হল বিদেশী শাসন ব্যবস্থা ও শাসকদের বিরোধিতা করা। দেশীয় শাসন, তা ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন বিদেশী শাসন তাকে আঘাত করে এই আঘাত প্রতিহত করতে পারলে নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া তদানিন্তন সময়ে দেশপ্রেম ছিল একটি সার্ব্বজনীন আদর্শ যা প্রতিটি মানুষ এবং সম্প্রদায়কে কমবেশী ছুঁয়ে গিয়েছিল। একই আদর্শ কোন কোন ব্যক্তি তাঁরা জমিদার হলেও তাঁদের বিবেককে ছুঁয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তা পরম্পরাতেও থেকেছে। আবার কোথাও বা থাকেনি। মেদিনীপুরের নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান, মুগবেড়িয়ার দিগম্বর নন্দ, জাড়ার জমিদার সাতকড়ি পতিরায়, তমলুক ও খন্ডরুই রাজবংশ এই তাগিদ থেকে সেদিন মুক্তি সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন।

অপর একটি দিকও এখানে উল্লেখ্য, জমিদারদের একটি অংশ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য আন্দোলনকে সাহায্য করার পাশাপাশি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, কারণ গ্রামাঞ্চলের শাসক ছিলেন এরাই। প্রাদেশিক আইনসভায় এবং জেলাস্তরে বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কারণে সরাসরি শাসন ব্যবস্থার মধ্যে জমিদাররা এসে গিয়েছিলেন। ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট, পঞ্চায়েত, চৌকিদারসহ বিভিন্ন স্তরে নিজস্ব লোকজনদের নিয়োগ করে জমিদাররা শাসন ব্যবস্থাকে সরাসরি পরিচালনাও করেছিলেন। সুতরাং বলা যায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল তাতে জমিদারদের না এসে উপায় ছিল না। চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাই তাদের প্রখর দৃষ্টি দিতেই হয়েছিল। এই আশঙ্কা তাদের ছিল যে আন্দোলনকারীদলের সঙ্গে যদি যোগাযোগ না রাখা যায় তাহলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জমিদারী ধরে রাখা সম্ভব হবে না। এটা কোন চালাকির প্রশ্ন নয় বরং পরাধীনতার থেকে নিজে এবং সেই সঙ্গে স্বাদেশবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক, একই সাথে স্বাধীনভাবে জমিদারী এলাকায় শাসকের কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠার চাহিদা ছিল তাদের অন্তরে। তাই এদেশের বৃহৎ বুর্জোয়ারা আপোষকামী হলেও এদের তুলনায় যাদের পেটিবুর্জোয়া বলা হয়েছে তাদের একটা অংশ তদানিন্তন সময়ে বিপ্লববাদের পাশে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই দ্বিমাত্রিক চরিত্রকে বজায় রেখে নাড়াজোলের জমিদার সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সমগ্র দেশে জমিদারদের আপোসকামী ভূমিকা যখন মুখ্য ছিল, সেই সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের সুতিকাগার হিসেবে চিহ্নিত মেদিনীপুরের মত একটি জেলাতে, বৈপ্লবিক সংস্কৃতি চর্চার সম্প্রসারণে নাড়াজোল রাজের এবং তাদের প্রভাবিত এইচ. ই. স্কুলের এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক।

**তথ্যসূত্রঃ**


*1 /* File No 215 of 1931, 1047 of 1933, Department of Political, Government of Bengal.

*2 /* বিমল দাশগুপ্ত 'আমার স্মৃতিকথা' প্রকাশক; বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি ২০১০, মেদিনীপুর পৃষ্ঠা-৩।

*3 /* File No 87 of 1922, Political Department, Government of Bengal.

*4 /* File No1074 of 1933, Political Departmen, Government of Bengal.

*5 /* Report of the Intelligence Branch, 1933, Government of Bengal.

*6 /* File No 1074 of 1933, Political Department, State Archives.

*7 /* ছাত্রদের উপর দীনেশের প্রভাব সম্পর্কে ডগলাস হত্যার অন্যতম আসামী ফনীন্দ্র কুমার দাস লিখেছেন "তাঁহার আকর্ষণীয় রূপ, অটুট উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, আদর্শ চরিত্র, বলিষ্ঠ পৌরুষ, মুষ্ঠী যোদ্ধা, কুস্তিগীর, ছোরা খেলায় পারদর্শী, যে ছেলে তাঁহার সন্নিকটে আসিয়াছে তাঁহাকে গুরুর আসনে বসাইয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে বিপ্লব মন্ত্র দীক্ষা লইয়াছে।" বিমল দাশগুপ্ত সম্বর্ধনা স্মরণিকা, মেদিনীপুর, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা – ৩২।

*8 /* File No 30 of 1930. Intelligence Branch, Government of Bengal.

*9 /* বিমল দাশ গুপ্ত 'আমার স্মৃতিকথা' প্রকাশক; বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি ২০১০, মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা-৩।

*10 /* File No 542 of 1936, Political Department, Govt. of Bengal.

*11 /* "He was one of the principal supporters of the boycott movement, and when the question of the partition of Bengal was being freely discussed in the beginning of 1905, he presided over a protest meeting at Midnapur." History Sheet No -711, Narendra Lal Khan Raja of Narajole. I.B. Department. Govt. of Bengal. July 1912.

*12 /* Ibid.

*13 /* Red, blue and white identity cards were issued to all the Hindu Bhadralok youths between the ages 14 to 30. The white cards indicated non-suspects, blue cards indicated less suspects but the red cards are the holders of whom everybody should be alerted."(41) Nerendra Nath Das 'Fight for Freedom in Midnapur' 1st Publication 1962 by Midnapur samskriti parishad, page - 147-148.

*14 /* File No 1047 of 1933 political Department Govt. Of Bengal

*15 /* Narajole Mahendra Academy Satabarsiki Smranika, 1994 p-04। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বড়দা। মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার তিনি আদি পুরুষ ছিলেন। তিনি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আলিপুর বোমা মামলার ফলে তার চাকুরী চলে যায়। তিনি বহু বছর ধরে নাড়াজোল রাজের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।

*16 /* Report of the Intelligence Branch 291 of 1935.

*17 /* File No 542 of 1936, Political Department, Govt. of Bengal.

*18 /* 'Report of the Intelligence Branch', 291 of 1935, Govt. of Bengal.

*19 /* 'Report of the Intelligence Branch', 291 of 1935, Govt. of Bengal.

*20 /* File No 542 of 1936, Political Department, Govt. of Bengal.

*21 /* 'Report of the Intelligence Branch', 291 of 1935, Govt. of Bengal.

*22 /* 'Report of the Intelligence Branch', 41 of 1936, Political Department, Govt. of Bengal.

*23 /* File No 542 of 1936, Political Department, Govt. of Bengal.

*24 /* 'Report of the Intelligence Branch', 86 of 1936,Govt. of Bengal.

*25 /* 'Report of the Intelligence Branch', 18.08.1935, Govt. of Bengal.

*26 /* 'Report of the Intelligence Branch', 147 of 1935, Govt. of Bengal.

*27 /* 'Report of the Intelligence Branch', 147 of 1935, Govt. of Bengal.

*28 /* 'Report of the Intelligence Branch', 291 of 1935, Govt. of Bengal.

*29 /* 'Report of the Intelligence Branch', 128 of 1936, Govt. of Bengal.

*30 /* File No 30 of 1930, Intelligence Branch, Govt. of Bengal.

*31 /* 'Report of the Intelligence Branch', 291 of 1935, Govt. of Bengal.

*32 /* File No 542 of 1936, Political Department, Govt. of Bengal.

*33 /* File No 30 of 1930, Intelligence Branch, Govt. of bengal.

*34 /* 'Report of the Intelligence Branch', 29 of 1934, Govt. of Bengal.

*35 /* 'Report of the Intelligence Branch', 84 of 1934, Govt. of Bengal.

*36 /* File No 30 of 1930, Intelligence Branch, Govt. of Bengal.

*37* / File No 30 of 1930, Intelligence Branch, Govt. of Bengal.

*38* / File No 30 of 1930, Intelligence Branch, Govt. of Bengal.

*39* / 'Report of the Intelligence Branch', 291 of 1936, Govt. of Bengal. Bñ C.A. 27 of 26.01.1934 said that Ananta Mukharji (Arms Act Convict) in 1934 started a Jugantar group which was carried on by Susanta Maiti and Sachin Maiti respectively. The following were members: Rabindra Lal Khan of Narajole. (Report of the Intelligence Branch, 29 of 1934, Govt. of Bengal. নাড়াজোল রাজপরিবারের স্বাধীনতা সংগ্রামী রবীন্দ্রলাল খানের সাক্ষাৎকার। ১৯৯২ সালে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন দেবাশিস ভট্টাচার্য ও জীতমোহন মিদ্যা। ১৯৯২ সালে এই সাক্ষাৎকারটি নাড়াজোল থেকে প্রকাশিত 'মধুকরী' পত্রিকাতে ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রলাল খান ঐ ক্যাম্পে ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলেন।

*40* / File No 542 of 1936, Department of Political, Govt. of Bengal.

*41* / Report of the Intelligence Branch, Govt. of Bengal 41 of 1934.

*42* / Report of the Intelligence Branch, 291 of 1935, Govt. of Bengal.

*43* / File No 542 of 1936, Department of Political, Government of Bengal.

*44* / File No 542 of 1936, Department of Political, Government of Bengal,

*45* / File No 542 of 1936, Department of Political, Govt. of Bengal

*46* / File No 542 of 1936, Department of Political, Govt. of Bengal

*47* / Office it to say that during the history of the enquiries into the activities in this school not a single instance can be quoted of masters volunteering any information. It is also not an exaggeration to say that these masters were chosen because of their nationalistic learning and activities. (File No 542 of 1936, Department of Political, Govt. of Bengal)

*48* / Report of the Intelligence Branch, 128 of 1936, Govt. of Bengal.

*49* / Report of the Intelligence Branch, 291 of 1935, Govt. of Bengal.

*50* / Report of the Intelligence Branch, 475 of 1934, Govt. of Bengal.

*51* / A deponent in his statement said that 8/9 students of Naranjole H.E. School attended the Calcutta Congress in 1922.The student were enlisted as volunteers. Two teachers Viz-Golak Bihari Goswami and Nakul Chandra Pal headed the students Satish Khan also accompanied this party. (Report of the Intelligence Branch, 475 of 1934, Government of Bengal).

*52* / Report of the Intelligence Branch, 36 of 1936, Govt. of Bengal.

*53* / Report of the Intelligence Branch, 41 of 1936, Govt. of Bengal.

*54* / The head masters own nephew Sailendra Nath Mallik was a teacher in his school, he is a known member of the revolutionary Party. As a result of investigation into his activities he was removed by D.M. from his appointment forcibly and domiciled in his home. (Report of the Intelligence Branch, 99 of 1934, Govt. of Bengal.)

*55* / Report of the Intelligence Branch, 99 of 1934, Government of Bengal.

*56* / M.R. 67, whose information have been proved as correct and most reliable sums the matter up very secretly when he says 20/25 students of the Narajole School have been important members of our secret organisation. They are scattered throughout Ghatal Sub- Division, Debra and Keshpur Thanas. Their activities have come to light even in Bankura. Report of the Intelligence Branch, 29 of 1935, Govt. of Bengal.

*57* / Report of the Intelligence Branch, 29 of 1935, Government of Bengal, File No 542 of 1936, Govt. of Bengal.

*58* / Report of the Intelligence Branch, 29 of 1935, Government of Bengal, File No 542 of 1936, Govt. of Bengal.

*59* / File No 542 of 1936, Political Department, Government of Bengal.

*60* / File No 542 of 1936, Political Department, Govt. of Bengal.

*61* / File No 542 of 1936, Narajole H.E. School, Daspur Police Station, Political Department, Government of Bengal.

*62* / File No 542 of 1936, Narajole H.E. School, Daspur Police Station, Political Dept. Govt. of Bengal.

*63* / File No 542 of 1936, Narajole H.E. School, Daspur Police Station, Political Dept. Govt. of Bengal.

*64* / শ্রী বিনয় জীবন ঘোষ ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, ১৯৩৩ সালে বার্জ হত্যার পরে তাঁর চাকুরী চলে যায় ও তিনি জেলা থেকে বহিঃষ্কৃত হন। বার্জ হত্যার অপরাধে তাঁর ভাই নির্মল জীবনের ফাঁসি হয় ১৯৩৪ এর ২৭শে অক্টোবর, আর এক ভাই নবজীবন ঘোষকে ১৯৩৬ সালে ২২ শে সেপ্টেম্বর পুলিশ লকাপে পিটিয়ে হত্যা করে গোপালগঞ্জ জেলে। আর একভাই যতিজীবন ঘোষ পেডি হত্যার অপরাধে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলে বন্দি ছিলেন। লেখক বিনয় জীবন ঘোষও দুই দফায় মোট ৫ বছর ধরে জেলে বন্দি ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালের পর থেকে নাড়াজোলের কুমার

দেবেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত সচিব হন। বিনয় জীবনের গ্রন্থ ‘হয়েছিল পরিচয়’ থেকে তথ্যটি নেওয়া হয়েছে। কে. পি. বসু প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪০৬। পৃঃ ৪০।